সংবাদ

তারিখ ... 11 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৭ ...

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা মেধা বিকাশের অন্তরায়

আকরাম খান

নতুন খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিনেই দেশের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত সরকারিভাবে সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন পাঠ্য বই পৌঁছে দেয়া হয়। শিক্ষার স্তর অনুযায়ী সেগুলোকে জ্ঞানার্জন ও মেধা বিকাশের উপযোগী ও পর্যাপ্ত গবেষণার মধ্য দিয়েই প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা মনে করি, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে সেগুলো উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য। গরিব, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্পটি আনন্দের এবং মানসিক চাপমুক্ত নতুন শিক্ষা বছরের শুরু সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয়, সেই আনন্দ আর মানসিক তৃপ্তি খুব বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি। এক সপ্তাহ কিংবা বড়জোর এক পক্ষকাল পরেই শুরু হয় চাপাচাপি, বই কেনার বাড়তি ঝামেলা। কিছু অভিভাবক বিগত বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরপরই পুরনো বই সংগ্রহ করে সন্তানকে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পাঠাতে শুরু করেন ভালো ফল নিশ্চিত করতে। জানুয়ারি কোনমতে কাটলেও ফেব্রুয়ারিতে নোট-গাইড কিনে না দিলে সন্তানরা আর বিদ্যালয়ে যেতে চায় না। নোট বা গাইড বইগুলোর ওজন এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা এত বেশি যে, একটি বইয়ের মূল্য সব পাঠ্যবইয়ের মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি (যদি পাঠ্যবইগুলো কেনা লাগত)। ওই হয় গাইড বইয়ে যথেষ্ট অপ্রয়োজনীয় ও পাঠ্যবই বহির্ভূত বিষয় জুড়ে দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকরা কেউ ব্যক্তিগত পছন্দে আবার কোথাও শিক্ষক সমিতির নামে অনৈতিক উপায়ে বিভিন্ন গাইড বই নির্ধারণ করে থাকেন।

সরকারিভাবে নোট-গাইড নিষিদ্ধ করা হলেও সেটি ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতা একবারেই ভিন্ন। আমাদের শিক্ষা জীবনে যারা নোট বই কিংবা প্রাইভেট পড়ত তাঁরা ছিল নিন্দনীয় এবং মান বিচারে কম মেধাবী। পরীক্ষায় নকল করার মতো কম মেধাবীদের এ কাজটি খুব গোপনে করতে হতো। সময় পাল্টে গেছে। এখন কম মেধাবী এবং গরিব শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই নাড়াচাড়া করে, প্রইভেট পড়ে না। অন্যদিকে মেধাবীরা বিদ্যালয়ে না গিয়ে বড় বড় গাইড বই পড়ে, দিনে কম পক্ষে চার থেকে ছয়জন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে। এর ফলে মেধাবীরা নাকি ভালো ফল করে, তবে কম মেধাবীরাও ফেল করে না। চলমান অবস্থায় ফেল শব্দটিকে শিক্ষাঙ্গন থেকে বিদায় করার উদ্দেশ্যে যে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতাই অর্জন করে না, তারাও পাস করে যাচ্ছে। এটা নাকি শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের শিক্ষাবান্ধব নীতির অংশ! এই নীতিতে পরীক্ষা পদ্ধতি যাই থাক না কেন, মেধাশূন্য হয়ে পড়ছে নতুন প্রজন্ম কিংবা মেধাবীদের মেধা বিকাশ ও মেধার স্তর নির্ধারণ হোঁচট খাচ্ছে দারুণভাবে। শিক্ষার শ্রেণী বিন্যাস যদি হয় জ্ঞানার্জন ও মেধা ক্রমবিকাশের মাধ্যম, তাহলে এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। পরীক্ষার মূল্যায়ন এবং মেধার স্তর নির্ধারণী বিষয়ে তড়িঘড়ি এবং ঢালাওভাবে উচ্চতর নম্বর প্রদানের কারণে প্রকৃত মেধাবীদের চিহ্নিত করা যাচ্ছে না বলে অনেকেই অভিযোগ তুলেছেন। ফলে মেধাবীদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে হতাশা। যে কোন প্রতিযোগিতায় হতাশা মারাত্মক প্রভাব ফেলে, যোগ্যতা ও দক্ষতার পরাজয় অনেকখানি ত্বরান্বিত করে।

বর্তমানে দেশের পরীক্ষা পদ্ধতিতে দুটি ধারা বিদ্যমান। একটি কাঠামোবদ্ধ (সৃজনশীল), অপরটি বহু নির্বাচনী (এমসিকিউ)। কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নে পাঠ্য বইয়ের বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দীপকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্বকীয় মেধার মান নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত, যুক্তি ও উপস্থাপনই সেই মান নির্ণয়ের উপায়। সম্মানিত শিক্ষকদের সবাই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন কিনা কিংবা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি বিবেচনা করতে সক্ষম কিনা অথবা অভিজ্ঞ কিনা বলা মুশকিল। শ্রেণীকক্ষে বিশ্রাম নিয়ে বাকি সময় প্রাইভেট ও কোচিং বাণিজ্যে শ্রম দিতেই অনেক শিক্ষক অভ্যস্থ। আর যাই হোক শিক্ষার্থীদের ফেল করার দুঃশ্চিন্তা তাদের করতে হয় না। প্রাইভেট ছাত্রছাত্রীদের এ প্লাস পাওয়ার জন্য অসদুপায় বাতলে দেয়া, এমন কি অনৈতিক অসৎ কর্মেও তাদের অনেকেই দ্বিধা বোধ করে না। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের কাজ শুধু পরীক্ষা নেয়া। কর্মরত শিক্ষকদের কাজ নোট গাইড মুখস্ত করানো। কাজেই বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদানের এই মহৎ উদ্যোগ ও প্রণোদনা মূল্যহীন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতির অপর ধারায় বহু নির্বাচনী প্রশ্নের উত্তর দেয়া কিছু শিক্ষার্থীদের জন্য লটারি খেলা। অনুমানে উত্তর দিয়েও কেউ ভালো নম্বর পেতে পারে। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ নিতান্তই ফেল করে সেটিকে ব্যতিক্রম বলতে হয়। বৃত্ত ভরাট বা টিক চিহ্নের পরিবর্তে এক কথায় উত্তর লিখতে বলা হলেও পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের অন্তত পড়া এবং লেখা শিখতে হয়। বরেণ্য শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের ব্যাপারে দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা ও পরামর্শ দিচ্ছেন। তার অধিকাংশ মতামতের সঙ্গে আমরা ঐকমত্য পোষণ করি। সম্প্রতি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক প্রশ্ন ব্যাংক তৈরির ফর্মুলাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের আশঙ্কা ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আমলে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করা হয়েছিল। সেগুলো নোট-গাইড বইয়ে প্রকাশ করার জন্য উন্মুক্ত ছিল। তখন দেশে একটি জোক প্রচলিত হয় এমন যে, এক ছাত্রকে তার পিতার নাম লিখতে বলায় ছাত্রটির উত্তর ছিল- দয়া করে ৪টি নাম লিখে দিন, আমি একটিতে টিক বসিয়ে দেই। তবে সব ছাত্রছাত্রী যে একই মানের সেটি একেবারেই সত্য নয়। সচেতন অভিভাবকদের প্রচেষ্টা এবং ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় পড়া লেখা শেখা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য পড়ে এমন অনেকেই রয়েছে। তাদের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবদান কত শতাংশ সেটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীরাই ভালো বলতে পারেন। মুহম্মদ জাফর ইকবাল সাহেবের দৃষ্টিতে যেখানে হরহামেশাই সব পাবলিক পরীক্ষা থেকে শুরু করে ভর্তি পরীক্ষা, চাকরির পরীক্ষা এমন কি বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়, সেখানে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ওই প্রশ্নব্যাংক কি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে নাকি নিয়ন্ত্রিত? যদি সেটি উন্মুক্ত থাকে তাহলে যেমন, নিয়ন্ত্রিত থাকলেও সেটি কোন না কোনভাবে পৌঁছে যাবে নোট-গাইড প্রকাশক এবং কোচিং সেন্টারগুলোতে। ফলে এখন যাদের পড়তে হচ্ছে দশ কেজি ওজনের গাইড বই তখন পড়তে হবে কমপক্ষে চল্লিশ কেজি ওজনের গাইড বই। পড়তে পড়তে এবং কোচিং সেন্টার, প্রাইভেট টিউটর এবং অভিভাবকদের চাপে মানসিক রোগী কিংবা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে হবে শিক্ষার্থীদের। সনাতন পদ্ধতিতে যখন পরীক্ষার প্রশ্ন করা হতো তখন শিক্ষার্থীদের অন্তত পাঠ্যবই সম্পর্কে ধারণা থাকতে হতো। সত্য-মিথ্যা, শূন্যস্থান পূরণ, সংক্ষেপে উত্তর এমন কি কবিতার শেষ আট লাইন সুন্দর করে লেখা ইত্যাদি পাঠ্যবই না পড়ে কারও উত্তর লেখার সুযোগ থাকত না। অবশ্য রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরে নোট-গাইডের প্রভাব ছিল অনুশীলনীতে নমুনা প্রশ্ন থাকার কারণে অথবা নমুনা প্রশ্নের বাইরে কোন প্রশ্ন তৈরি না করার কারণে। তবুও জ্ঞানের জন্য শিক্ষা, শিক্ষার মাধ্যমে মেধা বিকাশ এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরাকেও পাঠ্যবই পড়ানো সহ-পাঠ্য বইয়ের শিক্ষণীয় বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করানোর প্রয়োজন হতো।

ঘন ঘন শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ নতুন নতুন বিষয় সংযোজিত হওয়ায় শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা কোনই কাজে লাগছে না। তাদের জন্য সময়োপযোগী পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের দরকার। আবার নতুন বিষয়গুলো চূড়ান্ত পরীক্ষা থেকে বাদ দিলে শরীর চর্চা, বই পড়া, নীতি-নৈতিকতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মতো সহশিক্ষার বিষয়গুলোর যেমন কোন চর্চা হয় না তেমনি স্কুল-কলেজে শিক্ষক থাকবে, বিষয় থাকবে কিন্তু শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর প্রয়োজন হবে না। সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করার দক্ষতা ও যোগ্যতা কিংবা মান যাচাইয়ের অভিজ্ঞতা যাদের নেই সেই সব শিক্ষক দিয়ে সৃজনশীল মেধা বিনির্মাণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন হাস্যকর। এখনও প্রায় শতভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রশ্ন তৈরির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে প্রশ্নপত্র কিনে আনতে হয়। তবে একথাও সত্য যে, পুঁথিগত বিদ্যা অবিদ্যারই নামান্তর। শ্রেণীভিত্তিক পুঁথি পুস্তকের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডারে পরিপূর্ণভাবে ধারণ করার নামই শিক্ষা। এ রূপ শিক্ষা পর্যায়ক্রমে মেধাবীদের মেধা বিকশিত করে, কম মেধাবীদের মেধা শাণিত করে। বর্তমানের ঢালাও পাস আর এ প্লাস তার প্রধান অন্তরায়। আমরাও চাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করুক। গ্রেডিং পদ্ধতিতে তাদের প্রকৃত মেধাস্তর নির্ধারিত হোক। নিয়ম অনুয়ায়ী ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রেরণ করার কথা। কিন্তু দেশের সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা জেনে গেছেন যে, কোনোভাবে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারলেই নিশ্চিত পাস। বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরীক্ষা বা নির্বাচনী পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হতে পারছে না, পাবলিক পরীক্ষায় তারাও ভালো ফলাফল করছে। এর ফলে প্রভাবশালী ও ম্যানেজিং বা গভর্নিং কমিটির দৌরাত্ম্য, ব্যক্তিগত অনুরোধে ঢেকি গেলাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং একক ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার মান সম্পর্কে কিছু বলাই বাহুল্য। এ ব্যাপারে আলাদা নিবন্ধের প্রয়োজন।

এতসব কিছুর পরও প্রকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা স্তরে গিয়ে নাস্তানাবুদ হতে হয়। ভর্তি পরীক্ষার নামে সেখানেও চলছে ভর্তি বাণিজ্য। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইউনিটভিত্তিক আবেদন ফির নামে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কমপক্ষে ডজনখানেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন দেখে মনে হয় সেটি একটি যুদ্ধক্ষেত্র। এমসিকিউ পদ্ধতিতে সেখানে এমন সব প্রশ্ন করা হয় যা কোন শিক্ষার্থী অতীতের কোন পাঠ্য বইয়ে তো নয়ই, শিক্ষা জীবনে কখনোই তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। বিভিন্ন নোট-গাইড থেকে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সংগ্রহ করে সেখানে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত মেধা যাচাইয়ের মহড়া দেয়া হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে পড়ার আগেই তাদের নোট গাইড বা কোচিং সেন্টারে গিয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা অন্ধের মতো রপ্ত করতে হয়। প্রাথমিক কিংবা মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্য বই বা স্তরভিত্তিক জ্ঞান আহরণ তাদের কাছে অসাড় ও অপ্রয়োজনীয়। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান আহরণ ও মেধা বিকাশের ঘাটতি হওয়ায় মেধাশূন্য নতুন প্রজন্মের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। একদিকে চাকরি বাণিজ্যের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পরিসেবা সংস্থাসমূহ এবং প্রশাসনিক দফতরের সব স্তরে মেধাবীদের প্রবেশাধিকার হরণ, অন্যদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণ ও মেধা বিকাশের বৈরী পরিবেশ জাতিকে এক কঠিন দুঃসময়ের দিকে ধাবিত করছে বলে মনে হয়। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রধান এবং সহজ উপায় হলো, সবার আগে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা। শিক্ষক হিসেবে মেধাবীদের অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষালয়েই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করা দরকার। যে কোন মূল্যে শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণের সব অপব্যবস্থা নির্মূল করে মানসিক চাপমুক্ত আনন্দ আলোয় শিক্ষালয়গুলোকে আলোকিত করতে হবে। সে আলোয় পতঙ্গের মতো শিক্ষার্থীরা যেন দলে দলে ছুটে এসে নিজেদেরকেও আলোকিত করতে পারে।

[লেখক : কলামিস্ট]
akramkhan.mdk@gmail.com